পানিপথের যুদ্ধে বাদশাহ বাবর

মুঘলদের সেনাবাহিনী-২

● শানজিদ অর্ণব

স্থলযুদ্ধ নিয়ে মুঘলরা অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। স্থলে সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার ব্যাপারে তারা কোনো সুযোগ ছাড়তেন না। মুঘলরা এদেশে এসেছিলেন মধ্যএশিয়া থেকে। সাগর ছিল তাদের কাছে অচেনা। ফলে ভারতে এসেও নৌবাহিনী নিয়ে তাদের তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মুঘল যুগে এশিয়ায় একমাত্র চীনেরই উল্লেখ করার মতো নৌবাহিনী ছিল। তবে মুঘল আমলে বড় বড় জাহাজ নির্মিত হতো। এসব জাহাজ চলত মূলত আরব সাগরে। ভারত থেকে মক্কায় হজযাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসব জাহাজ ব্যবহৃত হতো। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুরাট থেকে এসব জাহাজ মক্কায় যেত। এসব জাহাজের বর্ণনায় পর্যটক নিকোলো কন্টি বলেছেন, জাহাজগুলো আকারে বড় হলেও খুব মজবুত ছিল না। এমন একটি জাহাজে তিনি ১৭০০ লোক পরিবহন করতে দেখেছেন। মুঘলদের শক্তিশালী নৌবাহিনী না থাকায় সাগরে তাদের যাত্রী ও বাণিজ্য-জাহাজের নিরাপত্তার জন্য ইউরোপীয়দের সহায়তা চাইতে হতো। জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে বাণিজ্য-জাহাজকে রক্ষা করতে ঢাকায় মুঘলদের একটি বড় নৌবহর ছিল। ১৫৮২ সালে আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমলের বাংলার রাজস্ব নিয়ে তৈরি প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। জলদস্যুদের মোকাবেলা করতে আওরঙ্গজেব শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা খুব বেশিদূর এগোয়নি। পুরো ষোড়শ শতক এবং সপ্তদশ শতকের কয়েক দশক ভারতের স্থলভাগসংলগ্ন সাগরে আধিপত্য বজায় রেখেছিল পর্তুগিজরা। পর্তুগিজরা এ সাগর তাদের রাজার অধীন বলে দাবি করত। কিন্তু এ নিয়ে মুঘলরা তেমন কোনো জবাব দিতে চেষ্টা করেননি। কারণ মূলত সাগরে পর্তুগিজদের এ আধিপত্য স্থলের মুঘলদের জন্য কোনো হুমকি ছিল না। মুঘলদের চিন্তা ছিল কেবল স্থলকে দখলে রাখা।

মুঘলরা স্থলে নিজেদের অজেয় বলে বিবেচনা করতেন। সম্রাট আকবরের সময় ব্যাপারটা তেমনই ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময় এসে পরাক্রমশালী মুঘল সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৈষম্য, নৈতিক মানের অবক্ষয়সহ বিভিন্ন সমস্যা পর্যুদস্ত করে মুঘল সেনাবাহিনীকে। সম্রাট শাহজাহানের শাসনের শেষদিকে এবং আওরঙ্গজেবের শাসনামলে সৈন্যদের লুটপাট করার নজির আছে। মুঘল সেনাবাহিনীর সঙ্কট বেড়েছে তার আকারের সমানুপাতে। শাহজাহানের মৃত্যুর মাধ্যমে মুঘল সেনাবাহিনীর সমর নেশা লোপ পায়। জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই সেনাবাহিনীর গুণগত মান কমতে থাকে। তাভেরনিয়ার ভারতে এসেছিলেন সম্রাট শাহজাহানের সময়ে। তিনি বলেছেন, একশ ইউরোপীয় এক হাজার ভারতীয় সেনাকে পরাজিত করতে পারে। ভারতে আসা ইংরেজদের মধ্যে একটা প্রচলিত ঠাট্টা ছিল এমন যে, একজন পর্তুগিজ তিনজন ভারতীয়কে পরাজিত করতে পারে আর একজন ইংরেজ তিনজন পর্তুগিজকে পরাজিত করতে পারে। মানুচ্চি বলেছিলেন, ত্রিশ হাজার ইউরোপীয় সেনা মুঘল সাম্রাজ্য দখল করে নিতে পারে।

মধ্যযুগের যুদ্ধে সেনাদের সমর উদ্যম ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের বিলাসিতা ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর ধার কমিয়ে দেয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে মানরিক উল্লেখ করেন, 'মুঘলরা ভীরু এবং বিলাসপ্রিয়। তারা যোদ্ধা নন।'

মুঘলদের পক্ষে অনেক রাজপুত সেনা কাজ করতেন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে তারা আফিম সেবন করতেন। রাজপুতরা অসম সাহসী হলেও যুদ্ধের আগে এই আফিম নিয়ে নিজেদের উদ্দীপ্ত করে নিতেন। এমনকি মুসলিম সেনাদের অনেকেও যুদ্ধে যাওয়ার আগে আফিম সেবন করতেন। যুদ্ধের উদ্যমই শুধু যুদ্ধ জেতার জন্য যথেষ্ট নয়। দরকার নিয়মানুবর্তী, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগে এ বিষয়টি কঠোরভাবে পালন করা হতো। মনসারেট বলেছেন, রাজপুতদের নিয়ে মুঘলদের ধারণা ছিল– তারা জানে কীভাবে যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়, কিন্তু কীভাবে লড়তে হয় সেটা তারা জানে না। বাদশাহ বাবর লিখেছেন, 'যে সৈন্য তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে তার নাক কেটে সৈন্যদলের মধ্যে ঘোরানো হবে।' একইরকমভাবে শাসন করেছেন সম্রাট আকবর। মনসারেট জানাচ্ছেন, 'আকবর কঠোরভাবে সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন এবং এক্ষেত্রে তিনি কোনো হেরফের হতে দিতেন না।'

মুঘল তথা ভারতীয় সেনাবাহিনী বিরাট আকারের হলেও ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধগুলোও দিন ফুরাতে না ফুরাতেই শেষ হয়ে যেত।

যুদ্ধ নির্ভর করত অশ্বারোহী বাহিনীর প্রথম আক্রমণের ওপর। চল্লিশ হাজারের পদাতিক বাহিনীও দুহাজার অশ্বারোহীর সামনে টিকতে পারত না। আর সেনারা মোটেও দেশ বা রাজার পক্ষে যুদ্ধ করতেন না, তারা স্রেফ বেতনের বিনিময়ে যুদ্ধ করতেন। ফলে যুদ্ধের ময়দানে কমান্ডার মারা গেলে তার অধীনের সেনারা রণে ভঙ্গ দিতেন।

যুদ্ধে বিশ্বাস মধ্যযুগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। পানিপথে জয় সম্পর্কে বাদশাহ বাবর বলেন, 'এ সাফল্যকে আমি নিজের শক্তির ফল বলব না, এটা আমার প্রচেষ্টা থেকে তৈরি হওয়া সৌভাগ্যও নয়। এটা আল্লাহর করুণা এবং কৃপার নিদর্শন।' যুদ্ধে যাওয়ার আগে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের সেনারাই ধর্মীয় আচার পালন করতেন। জওহর জানিয়েছেন, কামরানের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার আগে সম্রাট হুমায়ুন, শাহজাদা আকবর এবং সেনাপতি আবুল মওলি গোসল করে জুমার নামাজ আদায় করেন এবং মাথায় সুগন্ধি লাগিয়ে নিজেদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে নেন। হিন্দুস্তানে আক্রমণের আগে হুমায়ুন শাহজাদা আকবরকে গোসল করিয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরান এবং আকবরের সামনে বসে কোরান পড়ে তার গায়ে ফুঁ দিয়ে দেন। মুঘলদের সব যুদ্ধই শুরু হতো সাফল্য কামনা করে প্রার্থনার মাধ্যমে। সৃষ্টিকর্তার আনুকূল্য ব্যতীত যুদ্ধ জয় করা যায় না। মুঘলরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড-র সুরের সঙ্গে নিজেদের ঐকতান বজায় রাখতে চাইতেন। তাই তারা যুদ্ধের দিন ঠিক করতেন নক্ষত্রের অবস্থান দেখে। প্রতিটি যুদ্ধের আগে তারা তাদের ভাগ্যগণনার আশ্রয় নিতেন। সাধারণ সেনা এবং কর্মকর্তারাও ভালো পোশাক পরে যুদ্ধে যেতেন। কারণ তারা এ যুদ্ধকে নিজের শেষ যুদ্ধ বলে বিবেচনা করতেন।

যুদ্ধযাত্রায় সৈন্যদলের সঙ্গে বিরাট এক জনগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে চলত। বিশেষত সরকার এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত মানুষ এবং তাদের পরিবাররা যেতেন এই যাত্রায়। হাজার হাজার মানুষের একটি দল ভ্রাম্যমাণ যাত্রায় শামিল হতো। নরিসের বর্ণনামতে, এ দলে থাকত 'স্ত্রী, গণিকা, শিশু, খোঁজা, বণিক, মহাজন, ব্যবসায়ী।' তবে রাজপুত নারীরা এই ভ্রাম্যমাণ যাত্রায় যেতেন না। মারাঠিদের ক্ষেত্রে শিবাজী নারীদের এ রকম যাত্রায় গমন নিষিদ্ধ করেন।

যুদ্ধযাত্রায় সেনারা কোনো আলাদা একক বাহিনী হিসেবে চলতেন না। দেখা যেত প্রত্যেক সৈন্য তার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছেন। সঙ্গে তার অস্ত্র, পারিবারিক মালামাল। সৈন্যদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থাও থাকত না। সেই ভ্রাম্যমাণ যাত্রায় থাকা ব্যবসায়ীরা তাদের মালামাল নিয়ে চলতেন। যাত্রা চলাকালীন তারা বাজার বসাতেন এবং সেনাদের সেখান থেকেই তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে হতো। সম্রাট শুধু এই ব্যবসায়ীদের থাকা নিশ্চিত করতেন, যাতে সেনারা দরকারি জিনিস কিনতে পারেন। এ ব্যবস্থা ভালোই কাজ করত। যুদ্ধে যাওয়ার আগে সেনাদের কয়েকমাসের বেতন দিয়ে দেয়া হতো যাতে তারা দরকারি জিনিস ঠিকভাবে কিনতে পারেন।

সেনাবাহিনী চলার সময় বিভিন্ন দিকে অগ্রবর্তী বাহিনী যেত যাতে অ্যামবুশ এড়ানো যায়। মনসারেট আকবরের কাবুল অভিযানে ছিলেন। তিনি জানান, সাম্রাজ্যের বাইরের কোনো এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আগে দূত গিয়ে সেখানকার স্থানীয় শাসকদের আশ্বস্ত করে আসতেন, যাতে তারা ভয় না পান। মুঘল সেনাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রার গতি ছিল দিনে দশ থেকে বারো মাইল।

যুদ্ধে সেনাবাহিনীর জন্য দুই ধরনের সঙ্কেত থাকত। একটি নিজের গোত্রের মধ্যে ব্যবহারের জন্য এবং অন্যটি পুরো সেনাবাহিনীর জন্য। এটা করা হতো যুদ্ধ-ময়দানে একে অপরকে চেনার জন্য। একজন বলতেন সঙ্কেতের প্রথম অংশ অন্যজন বলতেন শেষ অংশ। অনেক সময় শত্রুদের ভিড় থেকে নিজেদের পৃথক করতে সেনারা বিভিন্ন স্লোগান দিতেন। যেমন– মুসলমানরা বলতেন আল্লাহু আকবর! বা ইয়া মুইন!, রাজপুতরা বলতেন রাম! রাম!, মারাঠিরা বলতেন হর-হর মহাদেব! কিন্তু অনেক সময়েই এটা কাজ করত না। কারণ অনেক সময় দুপক্ষেই একই ধর্মের বা জাতির সেনারা থাকতেন।

মুঘল সেনা

রাজপুত সেনা

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধার্মিক বলে পরিচিত আওরঙ্গজেবের সময়েই মুঘল সেনাবাহিনী সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পতিত হয়। সেনাদের নৈতিক মানের চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটে। মানুষ তো বটেই, পশুদের সঙ্গেও অমানবিক ব্যবহার করা হতো তখন।

মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৈমুর লং। তৈমুর থেকে ভারতের প্রথম যুগের মুঘল শাসকরা সবাই ছিলেন সমর কুশল। তাদের উন্নত পরিকল্পনা বহু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের জয় এনে দিয়েছে। তৈমুর লং ভারতে এসে প্রথম হাতির মুখোমুখি হন। কিন্তু দ্রুতই তিনি হাতিকে মোকাবেলা করার উপায় বের করে ফেলেন। কাঁটা বিছিয়ে তিনি হাতিকে দিশেহারা করে ফেলেন। খড়ে আগুন দিয়েও হাতিকে কাবু করেন তিনি।

মুঘল এবং রাজপুতরা চোরাগোপ্তা হামলার নীতিকে নিন্দা করতেন। তাদের মতে, এটা হলো কাপুরুষতার নিদর্শন। তবে এক্ষেত্রে মারাঠিদের কোনো আপত্তি ছিল না। মারাঠিদের সেনাবাহিনীর গঠন ছিল মুঘলদের চেয়ে উন্নতমানের। তাদের সেনাবাহিনীতে ছিল সুনির্দিষ্ট পদবিন্যাস। মারাঠিদের কাছে জয়ই ছিল প্রধান বিষয়। আর রাজপুতদের কাছে গৌরব ছিল প্রধান। রাজপুতরা পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করতেন, কিন্তু মারাঠিরা পালিয়ে গিয়ে আরেকটি সুযোগ খুঁজত। মারাঠিরা মোটেই স্বপ্নবিলাসী ছিল না। যেমনটা ছিলেন মুঘলরা। বালক বয়সেই বাবর তার পিতার হারানো রাজত্ব পুনর্দখল করার প্রতিজ্ঞা করেন। তাই ইতিহাসে মুঘল সাম্রাজ্য গড়ে উঠলেও কোনো মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি। ■

তথ্যসূত্র : আবুল ফজল, আইন-ই আকবরী, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১০।
অব্রোহাম এরালি, দ্য মুঘল ওয়ার্ল্ড; লাইফ ইন ইন্ডিয়াস লাস্ট গোল্ডেন এজ, পেঙ্গুইন বুকস, নয়াদিল্লি, ২০০৭।